৭

বাংলাদেশের সংবিধান

ভূমিকা

বাঙালি জাতি রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রাম ও বহু তাজা প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। মিত্র ও মুক্তি বাহিনীর নিকট পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, এ দেশবাসী তাদের বিজয় নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ এ যুদ্ধে একাত্মতা ঘোষণা করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে গঠিত মুজিবনগর সরকার স্বাধীনতার পর ঢাকা স্থানান্তরিত হয়। ঢাকায় এসে এ সরকার প্রকৃত শাসনভার গ্রহণ করে। প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডন হয়ে ঢাকায় আসেন। তার পরের দিন অর্থাৎ ১১ জানুয়ারি "বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান অধ্যাদেশ" জারি করা হয়। এ আদেশ জারিই হল বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম পদক্ষেপ। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশে একটি নতুন ও সময়োপযোগী সংবিধান প্রণীত হয়।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- *পাঠ-১: বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন।*
- *পাঠ-২: বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য।*
- *পাঠ-৩: সংবিধানের সংশোধনীসমূহ।*

পাঠ - ১

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ থেকে আপনি—

- গণপরিষদের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- গণপরিষদের অধিবেশন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- গণপরিষদে সংবিধান প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- সংবিধান সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গণ-পরিষদ গঠন

সংবিধান হল রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক বিধি-বিধানের সমষ্টি। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণ-পরিষদ গঠন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নেও এমন একটি গণপরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদের সার্থক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে সংবিধান রচনা করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি গণরিষদ গঠনের আদেশ জারি করেন। এ আদেশ সমগ্র বাংলাদেশের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। এ আদেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকরী বলে ধরে নেয়া হয়। এ আদেশ বলে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। আইনের দৃষ্টিতে অযোগ্য বলে বিবেচিত এমন ব্যক্তিকে গণপরিষদের সদস্য হতে পারতেন না। রাজনৈতিক দল থেকে বহিঃস্কৃত ব্যক্তি গণপরিষদ থেকে বহিঃস্কৃত হতেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী সংবিধান রচনার পবিত্র দায়িত্ব এ পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল।

গণপরিষদের অধিবেশন

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার মাত্র ১১৬ দিন পর গণ-পরিষদের এ প্রথম অধিবেশন বসে। এ দিনটি জাতীয় জীবনে একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন বলে চিহ্নিত। এ অধিবেশনে গণপরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হয়। শাহ আব্দুল হামিদ গণপরিষদের প্রথম স্পীকার নির্বাচিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর নির্বাচিত হন জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ। এ অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠন করা হয়। এটি হল "সংবিধান কমিটি"। এ কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন তৎকালীন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন। এ কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৪ জন।

গণপরিষদে সংবিধান পেশ

সংবিধান কমিটিতে ড. কামাল হোসেন ছাড়া আরও চার জন মন্ত্রী ছিলেন। তারা হলেন যথাক্রমে - (১) সৈয়দ নজরুল ইসলাম; (২) তাজউদ্দিন আহমদ; (৩) খন্দকার মুশতাক আহমেদ; (৪) এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান। এ ছাড়া ৭ জন মহিলা সদস্যের মধ্যে একজন ছিলেন সংসদ সদস্য। এ কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল। কমিটি বিভিন্ন মহল থেকে সংবিধান সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করতে থাকে। ইতোমধ্যে কমিটি ৯৮টি প্রস্তাব গ্রহণ করে। সংবিধান কমিটি ১৯৭২ সালের ১৮ এপ্রিল সংবিধানের মুখবন্ধ (Preamble) রচনা সমাপ্ত করেন। ১৯৭২ সালের ১১ জুন কমিটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। তাঁরা সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। উক্ত সালের ১১ অক্টোবর সংবিধান কমিটির শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সংবিধান সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত পেশ করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। ঐ অধিবেশনে সংবিধান কমিটির সভাপতি ড. কামাল হোসেন সংবিধান বিল আকারে গণপরিষদে পেশ করেন। ১৩ অক্টোবর গণপরিষদ কিছু কিছু সংশোধনীসহ এ খসড়া সংবিধানের বিধিমালা গৃহীত হয়।

সংবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মতামত

১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর তৎকালীন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী খসড়া সংবিধান কমিটির পক্ষ থেকে গণপরিষদে পেশ করেন। এ সংবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, জনগণ ও রাজনৈতিক দল তাদের মতামত দেন। এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল -

(১) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, "এ সংবিধানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় নি।"

(২) তৎকালীন ছাত্রলীগের নেতা আ.স.ম.আব্দুর রব বলেন, "এ সংবিধান অগ্রহণযোগ্য, তবে সংবিধানের অনুপস্থিতিতে একটি মন্দ সংবিধানও গ্রহণযোগ্য।"

(৩) তৎকালীন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা সংসদ অধিবেশনে সংবিধানের ৬টি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে ভিন্নমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "খসড়া সংবিধান উৎপাদনের সকল উপাদান জাতীয়করণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু জনগণের মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর কোন ব্যবস্থা এতে নেই।" তিনি আরো বলেন, "জনগণ এ সংবিধান প্রত্যাখান করবে।"

(৪) ন্যাপ (মোজাফফর) নেতৃবৃন্দের মতে, "সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলোর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করার ফলে সেগুলো ক্ষুন্ন হয়েছে।"

(৫) বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ বলেন, "সংবিধানে কতকগুলো অগণতান্ত্রিক ধারা থাকলেও উক্ত সংবিধনে সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক ছিল, তবে এ সংবিধান সমাজতান্ত্রিক নয়।"

(৬) তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "বাংলাদেশ গণপরিষদ যে সংবিধান রচনা করেছে তা বাংলাদেশের জনগণের তাজা রক্তে লেখা হয়েছে।"

(৭) তৎকালীন আইন মন্ত্রী বলেন, "স্বপ্ন আজ বাস্তাবায়িত হয়েছে, এ সংবিধান বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসের এক বিরাট দিক দর্শন।"

খসড়া সংবিধান চূড়ান্তভাবে অনুমোদন

বাংলাদেশের তৎকালীন আইন মন্ত্রী ও সংবিধান কমিটির চেয়ারম্যান ড. কামাল হোসেন ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করেন। ১৮ অক্টোবর গণপরিষদে সংবিধান বিল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। এ আলোচনা ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আবার ৩১শে অক্টোবর উক্ত পরিষদে খসড়া সংবিধানের ধারাওয়ারী আলোচনা শুরু হয়। প্রথম দিনে ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক কিছু সংশোধনীসহ সংবিধানের ১৬টি অনুচ্ছেদ গৃহীত হয়। শাসন বিভাগ সম্পর্কিত সম্পূর্ণ অধ্যায়টি নভেম্বরের ২ তারিখ গৃহীত হয়। বহু বিতর্কিত ৭০ নং অনুচ্ছেদ অর্থাৎ দল ত্যাগ বা দল থেকে বহিস্কার হওয়ার কারণে সংসদ আসন শূন্য হওয়ার বিধানটি স্থগিত করা হয়। সংবিধানের কতিপয় সংশোধনীসহ খসড়া সংবিধানের সকল অনুচ্ছেদ ও তফসিল ৩রা নভেম্বর গৃহীত হয়। বিরোধী দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত উক্ত সংবিধানের লিপিগুলোতে স্বাক্ষর দানে বিরত থাকেন। ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর হস্তলিখিত সংবিধানে স্বাক্ষরদানের লক্ষ্যে গণপরিষদের সদস্যগণ পুনরায় একত্রিত হন। অবশেষে বিধিবদ্ধ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকরী হয়। মাত্র ১ বছরের মধ্যে দেশবাসী একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এ সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি আসলে বিরল। সংশোধনী সাপেক্ষে আজও এ সংবিধান ক্রিয়াশীল।

সারকথা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আবির্ভূত হয় একটি স্বাধীন দেশ রূপে। স্বাধীনতার পর পরই বাঙালি জাতি সংবিধান প্রণয়নে মনোনিবেশ করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুযায়ি পাকিস্তানী কারাগার থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। পরের দিনই সংবিধান রচনার নির্দেশ দেন। এ আদেশ বাংলাদেশে সংবিধান রচনার প্রথম পদক্ষেপ। ২৩ মার্চ সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে একটি ৪৩০ সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর ঢাকায় গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংবিধান কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন তৎকালীন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন। ড. কামাল হোসেন ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদে খসড়া বিধান পেশ করেন। পরিশেষে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর উক্ত সংবিধান বলবৎ করা হয়। ঐ দিন থেকে গণপরিষদ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১। কোন তারিখে সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গণপরিষদ গঠিত হয় ?

(ক) ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর (খ) ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ

(গ) ১৯৭২ সালের ৫ জুন (ঘ) ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি

২। কোন তারিখে সংবিধান কমিটি গঠিত হয় ?

(ক) ১৯৭২ সালের ৫ এপ্রিল (খ) ১৯৭২ সালের ৫ই জুন

(গ) ১৯২ সালের ১০ এপ্রিল (ঘ) কোনটিই নয়

৩। সংবিধান কমিটির সভাপতি কে ছিলেন ?

(ক) ডঃ কামাল হোসেন (খ) শেখ মুজিবর রহমান

(গ) মোহাম্মদ উল্লাহ (ঘ) শাহ আব্দুল হামিদ

৪। কোন তারিখ থেকে সংবিধান কার্যকরী হয় ?

(ক) ১৯৭২ সালের ২ ডিসেম্বর (খ) ১৯৭২ সালের ২রা জুন

(গ) ১৯৭২ সালের ২৫ ডিসেম্বর (ঘ) ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

৫। কোন তারিখ গণপরিষদ বাতিল করা হয় ?

(ক) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে (খ) ৫ জুন ১৯৭২ সাল

(গ) ১০ ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল (ঘ) কোনটিই নয়।

উত্তরমালাঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের গণপরিষদের গঠন প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠ থেকে আপনি—

◆ বাংলাদেশ সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করতে পারবেন।

সংবিধান কী

সংবিধান হল রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল বলেন, "Constitution is the way of life, the state has chosen for itself." বস্তুত সংবিধান হল রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক বিধি-বিধানের সমষ্টি। অধ্যাপক হারম্যান ফাইনার বলেন, "The system of fundamental political institution is the constitution." তাই সংবিধান হল রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক বিধি-বিধানের সমষ্টি।

বাংলাদেশ সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকরী হয়। মাত্র ১ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ সংবিধান রচনা করা হয়। এ সংবিধান বাঙালি জাতির জন্য একটি দর্পণ স্বরূপ। এ সংবিধানকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে

(১) **লিখিত সংবিধান :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি লিখিত দলিল। এ সংবিধানের অধিকাংশ বিধি-বিধান কাগজে কলমে লিখিত। এর ধারা ও উপ-ধারাগুলো লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ আছে।

(২) **বৃহৎ সংবিধান :** বাংলাদেশ সংবিধান আকারে অনেকটা বৃহৎ। অন্যান্য সংবিধানের তুলনায় এ সংবিধানের আয়তন বড়। এ সংবিধানে ১টি প্রস্তাবনা (Preamble), ১১টি ভাগ, ১৫৩টি বিধি (Articles) ও ৪টি তফসিল (Schedule) সন্নিবেশিত রয়েছে।

(৩) **সংসদীয় সরকার :** সংসদীয় সরকার বাংলাদেশ সংবিধানের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশ সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়েছে। এ সংবিধানে দেশের যাবতীয় ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এ সংবিধানে আরো বলা হয় যে, মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকবে।

(৪) **এক কেন্দ্রিক শাসন :** এক কেন্দ্রিক শাসন পদ্ধতি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সংবিধানে বাংলাদেশের শাসন পদ্ধতিকে এক কেন্দ্রিক শাসন পদ্ধতি বলে উল্লেখ করা হয়। সংবিধান মতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে ন্যস্ত রাখা হয়।

(৫) **সংসদীয় গণতন্ত্র :** বাংলাদেশ সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংসদীয় গণতন্ত্র। বাংলাদেশ সংবিধানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়। এ সংবিধানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করা হয়। সংবিধানের প্রথম অংশে উল্লেখ করা হয় যে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"। এ বিধান থেকে গণতন্ত্রের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

(৬) **দুস্পরিবর্তনীয়তা :** দুস্পরিবর্তনীয়তা বাংলাদেশ সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বাংলাদেশ সংবিধান দুস্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির। সংবিধানকে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। কেবল জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে এ সংবিধান সংশোধন করা যায়।

(৭) **আইনসভা :** আইনসভা বাংলাদেশ সংবিধানের একটি বিশেষ দিক। সংবিধানে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার কথা বলা হয়। সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এক কেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থার জন্য এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা উত্তম। সংবিধানে আরো উল্লেখ করা হয় যে, আইন সভার আসন বসবে রাজধানী ঢাকায়।

(৮) **মৌলিক অধিকার :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের একটি বিশেষ দিক হল মৌলিক অধিকার। এ সংবিধানে শুরু থেকেই মৌলিক অধিকারের বিধান রাখা হয়। এ সকল মৌলিক অধিকারের মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হল ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা চিন্তা ও বিবেচনার স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার ইত্যাদি।

(৯) **রাষ্ট্রীয় মূলনীতি :** রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ১৯৭২ সালের সংবিধানের একটি মূল বৈশিষ্ট্য। উক্ত সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা এই চারটি নীতিকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলোকে বাস্তবায়নের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় বিধান রাখা হয়। তবে পরবর্তীতে সংশোধনীর মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় বিচার ও ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার উপর আস্থা ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংযোজন করা হয়।

(১০) **নামমাত্র রাষ্ট্রপতি :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতির বিধান রাখা হয়। এ রাষ্ট্রপতি ছিল নামমাত্র। রাষ্ট্রপতি নাম মাত্র ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হবেন। পরবর্তীতে ৪র্থ সংশোধীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা কায়েম করা হয় এবং ১৯৯১ সালে আবার সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থায় ফিরে আসা হয়।

(১১) **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :** উক্ত সংবিধানে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগের বিধান রাখা হয়। এ সংবিধানে বাংলাদেশে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে। সুপ্রীম কোর্ট হবে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়। মৌলিক অধিকার ও সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব এ বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত।

(১২) **সংবিধানের প্রাধান্য :** ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংবিধানের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এ সংবিধানকে দেশের চরম ও চূড়ান্ত আইন বলে আখ্যা দেওয়া হয়। সংবিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে। সংবিধান পরিপন্থী যে কোন আইন বাতিল বলে গণ্য হবে।

(১৩) **দলীয় শৃংখলা :** দলীয় শৃংখলা ১৯৭২ সালের সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এ সংবিধানে দলীয় শৃংখলার ব্যাপারে কঠোর বিধান রাখা হয়। এটি সংবিধানের একটি অন্যতম বিশেষত্ব। এ সংবিধানে আরো উল্লেখ করা হয় যে, কোন সংসদ সদস্য দল ত্যাগ করলে বা সংসদে ঐ দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তাকে সংসদের পদ হারাতে হবে।

(১৪) **মালিকানা নীতি :** মালিকানা নীতি উক্ত সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। মালিকানার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান রাখা হয়। এ সংবিধানে বলা হয় যে, মালিকানা হবে তিন প্রকারের যথা : রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায় মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা। এর অধিকাংশ মালিকানা রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সীমিত থাকার বিধান রাখা হয়।

সারকথা

সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মৌলিক দলিল। বাংলাদেশ সংবিধানও এর ব্যতিক্রম নয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সংবিধান প্রবর্তন করা হয়। মাত্র ১০ মাসের মধ্যে এ দুরূহ কাজটি সম্ভব হয়েছিল। এটি একটি লিখিত সংবিধান। বহু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হল এ সংবিধান। দু'একটি সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ সংবিধান বিশ্বের একটি উত্তম সংবিধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ সংবিধানে কয়টি প্রস্তাবনার বিধান রাখা হয় ?

(ক) দুটি প্রস্তাবনা (খ) একটি প্রস্তাবনা

(গ) তিনটি প্রস্তাবনা (ঘ) কোনটিই নয়

২। বাংলাদেশ সংবিধানে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয় ?

(ক) ১১টি (খ) ১৩ টি

(গ) ৯ টি (ঘ) ১৫ টি

৩। বাংলাদেশ সংবিধানে অনুচ্ছেদের সংখ্যা ছিল -

(ক) ১৬০ টি (খ) ২৫৩ টি

(গ) ১৫৩ টি (ঘ) ১৪০ টি

৪। বাংলাদেশ সংবিধানে তফসিল এর সংখ্যা ছিল -

(ক) ৪ টি (খ) ৬ টি

(গ) ৩ টি (ঘ) ২ টি

উত্তরমালাঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে সংবিধানের মৌলিক স্তম্ভ কী কী?

২। বাংলাদেশ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

উদ্দেশ
এই পাঠ শেষে আপনি—
- ◆ বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ◆ প্রধান প্রধান সংশোধনীগুলোর বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি

বাংলাদেশ সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না। এ সংবিধান দুস্পরিবর্তনীয় ধরনের। সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে এ সংবিধান সংশোধন করা যায় না। বাংলাদেশ সংবিধান পরিবর্তনের জন্য বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। সংবিধানের দশম ভাগের ১৪২নং অনুচ্ছেদে বিধান রয়েছে যে, সংসদ আইনের দ্বারা বাংলাদেশের সংবিধানের কোন বিধান সংশোধিত বা রহিত করা যেতে পারে। তবে দুটি শর্ত পালনযোগ্য:

১. অনুরূপ সংশোধীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামে এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হবে বলে স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাবে না।

২. সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতি দানের জন্য তা রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপিত হবে না।

সংবিধান সংশোধনে উপরিউক্ত শর্ত দুটি পালন আবশ্যক। উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে কোন বিল সংসদে গৃহীত হলে তা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হয়। সাত দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপ্রধান বিলটিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এ ভাবে বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধন করা হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সংবিধানে বেশ কয়েকটি সংশোধন আনা হয়। এগুলো পর্যায়ক্রমে নিম্নে আলোচনা করা হল।

বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী (১৫ জুলাই, ১৯৭৩ সাল।)

১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই বাংলাদেশ সংবিধানে প্রথম সংশোধনী আনা হয়। এ সংশোধনীতে বাংলাদশ সংবিধানের ৪৭নং অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করা হয়। উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে ৪৭-(ক) নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে। এ সংশোধনীর মূল কথা ছিল "কোন শসস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা কোন যুদ্ধবন্দীকে গণহত্যা বা মানবতার বিরুদ্ধে, অপরাধ বা যুদ্ধ অপরাধ বা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির আটক, ফৌজদারী বিচার সোপর্দকরণ বা শাস্তিদানের বিধান করে এমন কোন আইন সংবিধানে যে কোন বিধান থাকা সত্ত্বেও বৈধ থাকবে, সংবিধানের কোন বিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্য হওয়ার কারণে এরূপ আইন অবৈধ বলে গণ্য হবে না। এর প্রতিকারের আশায় সুপ্রীম কোর্টে আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না।" এ সংশোধনীর ফলে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধী ও গণহত্যার অভিযোগে বন্দিদের বিচারের পথ সহজ হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ সাল।)

১৯৭৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সংবিধানে একটি সংশোধনী আনীত হয়। এটি সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী। এ সংশোধনীর গুরুত্বপূর্ণ দিক হল "জরুরি বিধানবলি"। এটি সংবিধানের নবম ভাগে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ সশোধনীর মূল কথা হল- "যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ অথবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দ্বারা বাংলাদেশ বা এর যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। এ ধরনের ঘোষণার বৈধতার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি-স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা পরবর্তী কোন ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা হবে অথবা জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হবে কিংবা ১২০ দিন অতিবাহিত হবার পূর্বে সংসদের প্রস্তাব দ্বারা অনুমোদিত না হলে তা কার্যকর হবে না। জরুরি অবস্থা চলাকালীন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্থগিত থাকবে।" এ সংশোধনের দ্বারা ২৬নং অনুচ্ছেদের শেষে একটি নতুন দফা সংযোজিত হয়; ৬৩নং অনুচ্ছেদের অংশ বাদ দেয়া হয়। ৭২নং অনুচ্ছেদের পরিবর্তন সাধন করা হয়। এ সংবিধানে আরো উল্লেখ করা হয়, - এ জরুরি অবিস্থায় গ্রেফতার ও আটকাদেশ সম্পর্কিত বিধানের অবসান ঘটবে।

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী (২৮ নভেম্বর, ১৯৭৪ সাল।)

১৯৭৪ সালের ২৮শে নভেম্বর বাংলাদেশ সংবিধানে তৃতীয় সংশোধনী গৃহীত হয়। এ সংশোধনীটি হল "বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্কিত সীমান্ত চুক্তি সংশোধনী।" বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বর নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। মোট ১৫টি এলাকার সীমানা রদ-বদল করা হয়। এ রদ-বদল কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সংবিধানে তৃতীয় সংশোধনী আনীত হয।

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী (২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫ সাল।)

এটি বাংলাদেশ সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ সংবিধানে যে সংশোধনী গৃহীত হয় তা সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী নামে পরিচিত। রাজনৈতিক ভাবে এ সংশোধনীর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সংশোধনীর মাধ্যমে বিরাজমান সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা ও একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ সংশোধনীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা যেতে পারে -

(১) **রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন:** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর প্রথম বৈশিষ্ট্য। উক্ত সংশোধনীর দ্বারা বাংলাদেশ পার্লামেন্টারী সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়।

(২) **একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা:** চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা বাংলাদেশে একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এ সংশোধনীর দ্বারা একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ দলটির নাম ছিল - বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ। সংক্ষেপে নাম ছিল বাকশাল।

(৩) **রাষ্ট্রপতির প্রভাব বৃদ্ধি:** সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এটি উক্ত সংবিধানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

(৪) **সাংবিধানিক আদালত গঠন:** সাংবিধানিক আদালত চতুর্থ সংশোধনীর একটি বিশেষ দিক। উক্ত সংবিধানের মাধ্যমে একটি সাংবিধানিক আদালত গঠন করা হয়। এ সংশোধনীর পূর্বে এ সাংবিধানিক আদালতের দায়িত্ব পালন করত সুপ্রীম কোর্ট। এ সংশোধনীর কারণে সুপ্রীম কোর্ট রীট জারি করার ক্ষমতা হারায়।

(৫) **ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদ সৃষ্টি:** বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা ভাইস-প্রেসিডেন্ট নামে একটি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে বিপুল ক্ষমতা প্রদান করা হয়। প্রেসিডেন্ট তাঁর এ বিপুল ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য ভাইস-প্রেসিডেন্ট নামে একটি নতুন পদ সৃষ্টি করেন।

(৬) **বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা হ্রাস:** সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারকের নিয়োগ ও অপসারণ সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেয়া হয়। (সংবিধান অনুচ্ছেদ ৯৫/৯৬)

বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী (৬ এপ্রিল, ১৯৭৯ সাল।)

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংশোধনী। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক শাসন বিরাজ করছিল। এ সময় রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক জারিকৃত আদেশ ও ঘোষণার দ্বারা বাংলাদেশ সংবিধানের কিছু কিছু সংশোধনী আনা হয়। পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা এ সংশোধনীকে বৈধতা দান করা হয়। তৎকালীন সময়ে সামরিক শাসক হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক পরিবর্তন ও সংশোধনী বিষয়াবলী হল - (১) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম (২) 'বাঙালি' শব্দটির পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' (৩) ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস (৪) 'সমাজতন্ত্র' মানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার (৫) মন্ত্রিসভার সদস্যগণের চার-পঞ্চমাংশের সংসদ সদস্য হবার বিধান (৬) মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মামলা রুজু করা (৭) সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠন (৮) গণভোট ইত্যাদি সংযোজন, পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। ফরমানসমূহ ইত্যাদির অনুমোদন ও সমর্থনের ফলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত প্রণীত সকল ফরমান বৈধ ঘোষণা করা হয় এবং তৎ সম্পর্কে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো কারণেই কোনো প্রশ্ন উত্থাপন না করার বিধান জারি করা হয়। (পঞ্চম সংশোধনী ১৮ অনুচ্ছেদ)

বাংলাদেশ সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী (৮ জুলাই, ১৯৮১ সাল।)

৮ জুলাই ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সংবিধানে ষষ্ঠ সংশোধনী গৃহীত হয়। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্তে এ সংশোধনী আনা হয়। ১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন। তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হয়। বিচারপতি সাত্তারকে শাসক দল বি.এন.পি. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনয়ন দান করে। এর ফলে সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয়। বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন কিনা সে বিষয় সন্দেহ দেখা দেয়। এ সংশোধনী দ্বারা উপ-রাষ্ট্রপতি থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ প্রশস্ত করা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী (১০ নভেম্বর, ১৯৮৬ সাল।)

এটি বাংলাদেশ সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য সংশোধনী। ১৯৮৬ সালের ১০ই নভেম্বর এ সংশোধনী গৃহীত হয়। মোট ২২৩ সদস্যের ভোটে এ সংশোধনী গৃহীত হয়। এ সংশোধনীর দ্বারা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের স্বীয় পদে অধিষ্ঠান থাকার বয়স ৬২ থেকে ৬৫ বছর করা হয়। এছাড়া এ সংশোধনীর উদ্দেশ্য ছিল ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ নভেম্বর পর্যন্ত এরশাদ সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান ও সংশোধনীসমূহের সাংবিধানিক বৈধতা দান। আরো উল্লেখ করা হয় যে, ঐ সকল কার্যক্রম ও সংশোধনী সম্পর্কে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাবে না।

বাংলাদেশ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী (৭ জুন, ১৯৮৮ সাল।)

বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ৮ম সংশোধনীর তাৎপর্য অপরিসীম। ১৯৮৮ সালের ৭ জুন এ সংশোধনী আনা হয়। এ সংশোধনীর মৌলিক বিষয়গুলো হল - (১) ইসলাম ধর্মকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা দান (২) হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি বেঞ্চ যথাক্রমে বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর ও সিলেটে স্থাপন করা (৩) বাংলাদেশের কোন নাগরিক রাষ্ট্রপতির অনুমতি সাপেক্ষে বিদেশ থেকে কোন উপাধি গ্রহণ করতে পারবে। রাজধানীর বানান Dacca এর পরিবর্তে Dhaka এবং বাংলা ভাষা ইংরেজি Bengali এর পরিবের্ত Bangla গৃহীত হয়। কিন্তু এ সংশোধনী হাইকোর্ট বিভাগীয় বেঞ্চ সম্পর্কে দু'জন নাগরিক রীট পিটিশন করেন। তারা দুজন হলেন - আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ও জালাল উদ্দিন। তাদের এ রীট পিটিশনের ফলে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের ৬টি স্থায়ী বেঞ্চ রহিত করা হয়। পরবর্তীতে এটি বাতিল হয়ে যায়।

বাংলাদেশ সংবিধানের নবম সংশোধনী (১১ জুলাই, ১৯৮৯ সাল।)

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব মওদুদ আহমেদ এ নবম সংশোধনী বিলটি উপস্থাপন করেন। এ বিলটির পক্ষে ২৭২টি ভোট পড়ে। কিন্তু বিপক্ষে কোন ভোট পড়েনি। এ সংশোধনীর মূল বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ:

(১) উপ-রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন;
(২) রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন একসঙ্গে একই সময় অনুষ্ঠিত হবে;
(৩) একাধিকক্রমে দু' মেয়াদ তথা ১০ বৎসরের বেশী কেউ রাষ্ট্রপ্রতি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না;
(৪) প্রতি ৫ বছর পর পর নিয়মিত রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে;
(৫) রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে তা নিরসনের জন্য সংসদ অধিবেশন আহ্বান।

বাংলাদেশ সংবিধানের দশম সংশোধনী (১৫ জুন, ১৯৯০ সাল।)

বাংলাদেশ সাংবিধানিক ইতিহাসে এ সংশোধনীটি বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। ১৯৯০ সালের ১৫ জুন এ সংশোধনটি গৃহীত হয়। তৎকালীন আইন ও বিচার মন্ত্রী হাবিবুল ইসলাম চতুর্থ জাতীয় সংসদে ১৯৯০ সালের ১০ জুন এ দশম সংশোধনী বিলটি উত্থাপন করেন। ১১ জুন থেকে এ সংশোধনীর উপর আলোচনা শুরু হয়। ২২৬-০ ভোটে সংশোধনী গৃহীত হয়।

(১) সংবিধানের ৬৫নং অনুচ্ছেদ সংশোধন সাপেক্ষে বলা হয় যে, আগামী ১০ বছরের জন্য জাতীয় সংসদে মহিলাদের ৩০টি আসন পুনরায় সংরক্ষণ করা হল।

(২) সংবিধানের ১২৩নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে ১৮০ দিনের মধ্যে এ পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ সংশোধনীর দ্বারা ইংরেজি ও বাংলা ভাষ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধানের অসঙ্গতি দূর করা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের একাদশ সংশোধনী (৬ আগস্ট, ১৯৯১ সাল।)

বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একাদশ সংশোধনীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বৈরাচারী এরশাদের পতন ঘটে নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের ফলে। গণ-অভ্যুত্থানের প্রধান লক্ষ্য ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য গণ-আন্দোলনের মুখে অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান এরশাদের পতন ঘটে। তিনি পদত্যাগ করার পূর্বে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে তার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তিনি যতদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তার যাবতীয় কার্যাদী অনুমোদনের জন্য সংবিধানে

এ একাদশ সংশোধনী আনীত হয়। সংশোধনীতে আরো উল্লেখ করা হয়, সংবিধান অনুসারে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ পুনরায় প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী (৬ আগষ্ট, ১৯৯১ সাল।)

বাংলাদেশ সংবিধানে ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট আরেকটি সংশোধনী আনা হয়। এটি সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী। এ সংশোধনীর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সংশোধনী বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বিরল ঐতিহাসিক নজীর স্থাপন করে। এ সংশোধনীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল - রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে মন্ত্রি পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন। ১৯৯১ সালের ৬ই আগস্ট ৩০৭-০ ভোটে এ সংশোধনী বিলটি গৃহীত হয়। এ সংশোধনীর প্রধান প্রধান দিকগুলো নিম্নে প্রদত্ত হল:

(১) **সংসদীয় সরকার:** দ্বাদশ সংশোধনীর প্রধান দিক হল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন। এ সংশোধনীর দ্বারা বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।

(২) **নামমাত্র রাষ্ট্রপতি:** এ সংশোধনীর দ্বারা বাংলাদেশে একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। তিনি আইনানুসারে সংসদ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হবেন। তিনি যাবতীয় বিষয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।

(৩) **রাষ্ট্রপতির মেয়াদ:** এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির মেয়াদ নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রপতি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। একাধিক্রমে তিনি ১০ বছরের বেশি মেয়াদে ক্ষমতায় থাকবেন না।

(৪) **উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলোপ:** উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলোপ দ্বাদশ সংশোধনীর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। দ্বাদশ সংশোধনীর দ্বারা উপ-রাষ্ট্রপতির পদটি বিলোপ করা হয়। এ সংশোধনীতে বলা হয়,কোন কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে জাতীয় সংসদের স্পীকার অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

(৫) **মন্ত্রিসভা গঠন:** মন্ত্রিসভা গঠন পদ্ধতি সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর একটি বিশেষ দিক। এ সংশোধনীতে বলা হয় বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থায় একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করবেন। তিনি হবেন এ মন্ত্রিসভার নেতা।

(৬) **গণভোট পদ্ধতি:** এ সংশোধনীতে গণভোট পদ্ধতির কথা বলা হয়। দ্বাদশ সংশোধনী দ্বারা কেবল প্রস্তাবনা, সংবিধানের প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ৮, ৪৮, ৫৬ ও ১৪২ সংক্রান্ত কোন সংশোধনী বিল গণভোট আকারে পেশ করার বিধান রাখা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী (২৬ মার্চ, ১৯৯৬ সাল।)

বাংলাদেশ সংবিধানের ইতিহাসে এ সংশোধনীটি বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। এ সংশোধনীর দ্বারা অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের জন্য একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান করা হয়। ১৯৯৬ সালের ২১ মার্চ জাতীয় সংসদে এ বিলটি উপস্থাপিত হয়। ২৪ মার্চ আইন মন্ত্রীর প্রস্তাব অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটিতে বিলটি প্রেরণ করা হয়। অবশেষে ২৬ মার্চ বিলটি সংশোধনী আকারে সর্বসম্মতিক্রমে ২৬৯-০ ভোটে গৃহীত হয়। এ সংশোধনীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল -

(১) জাতীয় সংসদ বিলোপের ১৫ দিনের মধ্যে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন।
(২) প্রধান উপদেষ্টাকে প্রধানমন্ত্রীর এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণকে মন্ত্রীর পদমর্যাদা দান।
(৩) এ সরকার নীতি নির্ধারণী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না।
(৪) যোগ্য প্রধান উপদেষ্টা পাওয়া না গেলে প্রেসিডেন্টকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন।
(৫) প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনাক্রমে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্য থেকে ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ।
(৬) এ সরকারের মেয়াদ হবে তিন মাস; নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ হলে তার হাতে এসব ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

চতুর্দশ সংশোধনী (২০০৪)

চতুর্দশ সংবিধান সংশোধনীতে বলা হয়েছে স্পীকার অথবা ডেপুটি স্পীকার সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ করাতে অসমর্থ হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পাঠ করানোর বিধান করা হয়। জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ৩০০ থেকে ৩৪৫-এ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪৫টি আসন হবে সংরক্ষিত মহিলা আসন। এ ৪৫টি বর্ধিত আসনে মনোনীত নারী প্রার্থীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর আওতায় সাধারণ আসনের সংখ্যানুপাতে নারী আসনগুলো ভাগ করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫ থেকে ৬৭ বছর, পিএসসির চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের বয়সসীমা ৬২ থেকে ৬৫ বছর এবং মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অবসর বসয়সীমা ৬০ থেকে ৬৫ বছরে উন্নীত করা হয়।

সারকথা

সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে আজ পর্যন্ত (জুলাই ২০০৯) মোট ১৪টি সংশোধনী গৃহীত হয়। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এ সংশোধনী গৃহীত হয়। ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এ সময়ে এ সংশোধনী গৃহীত হয়। এ সংশোধনীসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য হল প্রথম সংশোধনী, চতুর্থ সংশোধনী, অষ্টম সংশোধনী, দ্বাদশ সংশোধনী, ও ত্রয়োদশ সংশোধনীসমূহ। বিশেষ করে চতুর্থ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংশোধনী বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। এ সংশোধনীগুলো দ্বারা বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১। সংবিধান সংশোধনী সম্পর্কিত বিধান দশম ভাগের কত অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে?
(ক) ১২২নং অনুচ্ছেদে (খ) ১৪২নং অনুচ্ছেদে
(গ) ১৫২নং অনুচ্ছেদে (গ) কোনটিই নয়

২। বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী কোন তারিখে গৃহীত হয় ?
(ক) ১৫ জুলাই ১৯৭৩ সাল (খ) ২৪ জুলাই ১৯৭৩ সাল
(গ) ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫ সাল (ঘ) ২৪ মার্চ ১৯৭৩ সাল

৩। কোন সংশোধনীর দ্বারা বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয় ?
(ক) চতুর্থ সংশোধনী (খ) প্রথম সংশোধনী
(গ) দ্বাদশ সংশোধনী (ঘ) পঞ্চম সংশোধনী

৪। বাংলাদেশ সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে সংসদীয় সরকার প্রবর্তিত হয় ?
(ক) প্রথম সংশোধনী (খ) চতুর্থ সংশোধনী
(গ) অষ্টম সংশোধনী (ঘ) দ্বাদশ সংশোধনী

উত্তরমালা ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।
২। বাংলাদেশ সংবিধানে গৃহীত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২। বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।